প্রমীলা
স্মৃতিকথা সংগ্রহ

সংকলন ও সম্পাদনা

বিজিত ঘোষ

তৃতীয় খণ্ড

সেকালে বিখ্যাত, একালে বিস্মৃত
৫ জন লেখিকার ৫টি স্মৃতিকথা

পুনশ্চ

সূচিপত্র

			পৃষ্ঠা
	ভূমিকা	ড. বিজিত ঘোষ	০৯
১।	সেকেলে কথা	নিস্তারিণী দেবী	৪৯
২।	আমাদের কথা	প্রফুল্লময়ী দেবী	৯৭
৩।	শ্রাদ্ধিকী	কামিনী রায়	১১৫
৪।	গানের স্মৃতি	ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী	১৬৯
৫।	নারী আন্দোলন : স্মৃতিকথা	অপর্ণা পাল চৌধুরী	১৭৫

ভূমিকা

মেয়েদের পড়াশোনা শেখা শুরু হল এই তো সেদিন! দিনটা ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দের ৭ মে। ভারতে প্রথম বাংলায় সরকারি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন সরকারি শিক্ষা দপ্তরের শিক্ষা সংসদের সভাপতি ছিলেন ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন। তিনিই নিয়ে এলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়কে। প্রবর্তন হল বাংলায় মেয়েদের বিদ্যালয় শিক্ষার।

স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ভদ্রলোক মাত্রেই অনুভব করতে পারছিলেন সে-সময়। সেই প্রেক্ষিতেই রাজা রাধাকান্ত দেব নিজগৃহে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৮৪৫-এ আর একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রবর্তন করেন উত্তরপাড়ার জমিদার। বারাসতের প্রগতিশীল ব্যক্তিরা স্থাপন করেন (১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে) আরও একটি বালিকা বিদ্যালয়।

১৮৪৯-এর ৭ মে, বেথুন ও বিদ্যাসাগরের যৌথ প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয় 'ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল'। বেথুন-এর মৃত্যুর (১৮৫১) পর সেটি বিদ্যাসাগরের একক পরিচালনায় বেথুন স্কুল নামেই স্থায়িত্ব লাভ করে।

অবশ্য বিদ্যাসাগর ও বেথুনের অনেক আগেই ইংরেজ মিশনারিগণ অনেকগুলি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। সেটা ১৮১৮-১৮১৯ খ্রিস্টাব্দের কথা। ওই সময়েই (১৮৯০) 'ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি' নামে একটি খ্রিস্টান মহিলা সমিতির প্রচেষ্টায় আটটি মেয়েদের স্কুল চালু হয়। শুধু এ-গুলিই নয়, ১৮২২ থেকে ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কমপক্ষে আরও ত্রিশটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন 'চার্চ মিশনারি সোসাইটি'।

রক্ষণশীল হিন্দুরা মেয়েদের পড়াশোনা থেকে বঞ্চিত রাখতে চেয়েছে বরাবর, সেকালে। সমাজ-সংস্কারক রামমোহন রায় তাই এ-বিষয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন তাঁর 'প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ' প্রবন্ধে।

আগেই বলেছি, ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে বেথুন সাহেবের উদ্যোগে স্থাপিত হয়েছিল 'ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল'। তাতে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়াশীলদের চটে যাওয়ার সরস বর্ণনা পাই শিবনাথ শাস্ত্রীর প্রবন্ধে।

রক্ষণশীলগণ গেল গেল রব তুলতে থাকেন। 'এইবার কলির বাকি যা ছিল হইয়া গেল। মেয়েগুলো কেতাব ধরলে আর কিছু বাকি থাকবে না।' মেয়েদের শিক্ষা দিলে, তাদের অবরোধ মোচন করলে, তারা স্বামী, গুরুজনদের কথা শুনবে না। যে বছর বিয়ে হয় কৈলাসবাসিনীর, মোটামুটি সে সময়েই আধুনিক কবি ঈশ্বর গুপ্ত এই ভাবনাটিকেই প্রকাশ করেছিলেন বেশ রং চড়িয়ে।

আধুনিকা শিক্ষিতা বঙ্গনারীদের আদৌ প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করতে না পারা কবি ঈশ্বর গুপ্ত লিখে ফেললেন তাঁর সেই বিখ্যাত কবিতা। প্রবাদের মতো পরিচিতি পাওয়া তাঁর সেই কাব্য-পঙ্‌ক্তি:

আগে মেয়েগুলো ছিল ভালো, ব্রতধর্ম কর্তো সবে।
একা বেথুন এসে শেষ করেছে, আর কি তাদের তেমন পাবে।

যত ছুঁড়িগুলো তুড়ি মেরে, কেতাব হাতে নিচ্ছে যবে।
তখন এ. বি শিখে বিবি সেজে, বিলিতি বোল কবেই কবে।

তবে স্ত্রীশিক্ষার সমর্থন জানিয়ে পরে তো বটেই, আগেও কিছু লেখালিখি হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৮২২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কারের 'স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক' গ্রন্থটি। সেখানে গ্রন্থকার লিখেছেন—'এদেশের লোকেরা বিদ্যাশিক্ষা ও জ্ঞানের উপদেশ স্ত্রীলোককে প্রায় দেন না বরং তাহাদের মধ্যে যদি কেহ বিদ্যা শিখিতে আরম্ভ করে তবে তাঁহাকে মিথ্যা জনরবসিদ্ধ নানা অশাস্ত্রীয় প্রতিবন্ধক দেখাইয়া ও ব্যবহার দুষ্ট বলিয়া মানা করান।' পরবর্তীকালে (কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন 'এ প্লাইজ এসে অন নেটিভ ফিমেল এডুকেশন' (১৮৪১), ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে।) তারাশঙ্কর তর্করত্ন (হেয়ার পুরস্কারপ্রাপ্ত গ্রন্থকার) স্ত্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষার সমর্থনে লিখেছিলেন 'ভারতবর্ষীয় স্ত্রীগণের বিদ্যাশিক্ষা' নামের গ্রন্থটি। এই প্রেক্ষিতে উল্লেখ করা চলে (হরচন্দ্র দত্তের 'অ্যান অ্যাড্রেস অন নেটিবভ ফিমেল এডুকেশন' (১৮৫৬), দ্বারকানাথ রায়ের 'স্ত্রী শিক্ষা বিধান' (১৮৫৭), রামসুন্দর রায়ের 'স্ত্রীধর্ম বিধায়ক' (১৮৫৯), শ্যামলাল সেনের 'স্ত্রীজাতির বিদ্যাভ্যাসের ঔচিতানৌচিত্য বিচার বিষয়ক প্রস্তাব ,(১৮৬৩) প্রভৃতি প্রগতিশীল প্রবন্ধগুলির কথা উনিশের শতকে নারীশিক্ষা বিষয়ক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের তালিকা দিয়েছেন অধ্যাপক স্বপন বসু তাঁর 'উনিশ শতকে স্ত্রীশিক্ষা' গ্রন্থে।) আর সবার উপরে বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রমুখের প্রচেষ্টায় তখন বাংলাদেশে স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন শুরু হয়ে গেছে। বাঙালি মেয়ের লেখা প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ হল 'চিত্তবিলাসিনী'। প্রকাশকাল : ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দ। লেখিকা কৃষ্ণকামিনী দাসী। কলকাতার এঙ্গলো ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন যন্ত্র থেকে ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হওয়া এই গ্রন্থটি সম্পর্কে বলা হয়, —বাঙালি নারীর প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ হল কৃষ্ণকামিনী দাস (মিত্র মুস্তাফী) রচিত 'চিত্তবিলাসিনী নামা অভিনব কাব্যগ্রন্থ।'

লেখিকা স্বয়ং ভূমিকায় জানিয়েছেন : "অদ্যাপি অস্মদেশীয় মহিলাগণের কোন পুস্তকই প্রচারিত হয় নাই, সুতরাং প্রথমত: এই বিষয়ে হস্তার্পণ কদরা কেবল লোকের হাস্যাস্পদ হওয়া মাত্র, কিন্তু আমার অন্তঃকরণে যথেষ্ট সাহস জন্মিতেছে যে সামাজিক মহাশয়েরা আপাতত: স্ত্রীলোকের রচনা শুনিলেই বোধ হয় যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইবেন সন্দেহ নাই, আর আমার পুস্তক রচনা করিবার এই এক প্রধান উদ্দেশ্য যে উৎকৃষ্ট হউক বা অপকৃষ্ট হউক একটা দৃষ্টান্ত পাইলে স্ত্রীলোক মাত্রেই বিদ্যানুশীলনে অনুরাগী হইবে তাহা হইলেই এদেশের আর গৌরবের আর পরিসীমা থাকিবেক না, পরিশেষে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে এই ক্ষুদ্র পুস্তক রচনার সময় আমার প্রাণবল্লভ যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন এবং তিনি এ বিষয়ে মনোযোগী না হইলে কেবল আমা হইতে ইহা সম্পন্ন হইবার কোন প্রকার সম্ভাবনা ছিল না।"

বাঙালি নারী রচিত দ্বিতীয় মুদ্রিত গ্রন্থ হল, 'কি কি কুসংস্কার তিরোহিত হইলে শীঘ্র এদেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে?' গ্রন্থটির প্রকাশকাল ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দ। লেখিকা বামাসুন্দরী দেবী। বামাসুন্দরী দেবীর এই গ্রন্থটিই বাঙালি মহিলা রচিত প্রথম মুদ্রিত গদ্যগ্রন্থ। এই গ্রন্থটির শিরোনাম আসলে 'সোমপ্রকাশ'—সম্পাদকের এই নামের একটি প্রশ্নের উত্তর।

'সোমপ্রকাশ' পত্রিকায় (এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যা দ্বরকানাথ বিদ্যাভূষণের দ্বারা সম্পাদিত হয়ে প্রকাশ পায়। পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যা বার হয় ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের ১৫ নভেম্বর (১২৬৫ বঙ্গাব্দের ১ অগ্রহায়ণ) কলকাতার চাঁপাতলা যন্ত্র থেকে। সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক দ্বারকানাথ মূলত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপদেশ অনুসারেই পত্রিকাটি প্রকাশ করেন)। ১২৬৭ বঙ্গাব্দের ১৫ ফাল্গুন সংখ্যায় শ্রী লোকনাথ মৈত্রেয়ের এই প্রশ্নটিকে (কি কি কুসংস্কার তিরোহিত হইলে শীঘ্র এদেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে?) প্রথম প্রকাশিত হয়। সেই প্রশ্নের উত্তরে বামাসুন্দরী

দেবীর লেখাটি 'সোমপ্রকাশ'—সম্পাদককে মুগ্ধ করে। সম্পাদক স্রষ্টার রচনানৈপুণ্যে মুগ্ধ হয়ে প্রথমে সেটি 'সোমপ্রকাশ'—এ প্রকাশ করেন। পরবর্তীকালে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য এটি গ্রন্থাকারেও প্রকাশ করেন।

বামাসুন্দরী দেবীর অর্থাৎ বাংলা ভাষায় প্রথম গদ্য-গ্রন্থ লেখিকার গ্রন্থটির ভূমিকায় শ্রীলোকনাথ মৈত্রেয় লেখেন (১৭৮৩ বঙ্গাব্দের ৪ বৈশাখ, ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দ) :

ভূমিকা

কিছু দিন অতীত হইল আমার পরমাত্মীয় কন্যাসম স্নেহপাত্রী শ্রীমতী বামাসুন্দরী দেবীকে "কি কি সংস্কার তিরোহিত হইলে এ দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে" এই প্রশ্নটি দিয়াছিলাম। কতক দিন পরে তাহার উত্তর আমার হস্তগত হয়। আমি তাহার রচনা নৈপুণ্য দর্শন করিয়া যে প্রকার আনন্দিত হইয়াছি তাহা বাক্য দ্বারা ব্যক্ত করা সম্ভাবিত নহে। এই আনন্দই আমাকে উল্লিখিত প্রবন্ধটি প্রচার করিবার নিমিত্ত মুহুর্মুহু প্রেরণ করিতে লাগিল। আমি ১৫ই ফাল্গুনের সোমপ্রকাশে উহা প্রকাশ করিয়াছিলাম। কিন্তু সোমপ্রকাশ পত্রিকা পাঠ সকলের সুলভ নহে। বোধ হয়, অনেকে ঐ প্রবন্ধটির মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন নাই, অতএব এই রচনাটি যাহাতে সর্ব্ব সাধারণের নয়নগোচর হয়, এই অভিপ্রায়ে প্রবন্ধটি এক খান ক্ষুদ্র পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিলাম।

ইহার রচয়িত্রী তিন বৎসরের অধিক হইবে না, বিদ্যাচর্চা আরম্ভ করিয়াছেন। যত্নসহকারে বিদ্যার্জ্জনে নিবিষ্টমনা হইলে আমাদের দেশীয় রমণীগণ যে কত অল্পকাল মধ্যে বিদ্যা ও জ্ঞানালঙ্কারে ভূষিতা হইতে পারেন, তাহা এদেশের লোকের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়া আমার এই ক্ষুদ্র পুস্তক প্রচার করিবার অন্যতর উদ্দেশ্য। এক্ষণে সর্ব্ব সাধারণের নিকট বিনীত ভাবে আমার নিবেদন এই যে, তাঁহারা এই মহৎ দৃষ্টান্ত দেখিয়া স্ব স্ব পরিবারস্থ কামিনীগণের বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে যত্নশীল হউন।

ওই একই বছরে (অর্থাৎ ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে) কলকাতার ভাস্কর যন্ত্র থেকে মুদ্রিত হয়ে প্রকাশ পায় কালিঘাটের হরকুমারী দেবীর 'বিদ্যাদারিদ্র দলনী' নামে ৮৪ পৃষ্ঠার একটি কাব্যগ্রন্থ।

(দ্র: সঙ্ঘমিত্রা চৌধুরি, 'আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মহিলা রচিত রচনার'-ক্রমবিকাশ ১৮৫০-১৯০০ বোনা, ২০০২, পৃষ্ঠা ১১৭-১১৮ এবং বসন্তকুমার সামন্ত (সম্পাদিত) : 'বঙ্গমহিলা রচিত প্রথম দুটি মুদ্রিত গ্রন্থ' সাহিত্যলোক, ১৯৯৪ পৃষ্ঠা ৪৮-৪৯)।

(তথ্যসূত্র : 'অন্দরের ইতিহাস/নারীর জবানবন্দি/ প্রথম খণ্ড/ সম্পাদনা ও সংকলন/ প্রসূন ঘোষ অহনা বিশ্বাস, গাঙচিল, ২০১৩, পৃষ্ঠা ৪৬৪)

বাংলা ভাষায় সম্ভবত দ্বিতীয়

গদ্য-গ্রন্থ লেখিকা কৈলাসবাসিনী গুপ্ত জন্মেছিলেন ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে। ১৮৪৯ এ বারো বছর বয়সে যখন তাঁর বিবাহ হয়, তখন তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ নিরক্ষর। পরবর্তীকালে পড়াশোনা শিখে তিনি অনেকগুলো বই লিখেছিলেন। তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য : 'হিন্দু ফিমেলস বা হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থা' (১৮৬৩), 'হিন্দু মহিলাকুলের বা অবলাকুলের বিদ্যাভ্যাস ও তাহার সমুন্নতি' (১৮৬৫) এবং 'বিশ্বশোভা' (১৮৬৫) ইত্যাদি।

কৈলাসবাসিনী গুপ্ত সম্পর্কে খুব বেশি তথ্য পাওয়া যায় না। জানা যায় না তাঁর সঠিক মৃত্যু-তারিখও। তাঁর স্বামী দুর্গাচরণ গুপ্ত ছিলেন পণ্ডিত মানুষ। তাঁরই কাছে লেখাপড়া শিখে পূর্বোক্ত গ্রন্থ তিনটি রচনা করেন কৈলাসবাসিনী।

তাঁর রচিত 'হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থা' একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। গ্রন্থটির বিশেষ ঐতিহাসিক মূল্য অনস্বীকার্য। কেননা, এখানে তিনি কেবল নিজের কথাই লেখেননি, পাশাপাশি সেকালের হিন্দু স্ত্রী-জাতির সামাজিক অবস্থার সহজ সরল সরস বর্ণনাও দিয়েছেন। সেই প্রেক্ষিতে গ্রন্থটিকে সমকালিন সমাজের একটি বিশ্বস্ত চিত্র বলা যেতে পারে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে প্রথম গদ্য-গ্রন্থের হিন্দু মহিলা লেখক যদি হন বামাসুন্দরী দেবী তাহলে প্রথম মুসলমান গদ্য-লেখিকা হিসাবে উল্লেখ করতে হয় বিবি তাহেরন নেসার কথা (১৮৪৭/১৮৫৮)। অবশ্য আনিসুজ্জামান-এর 'মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য' গ্রন্থ থেকে আমরা ফয়জুন্নেসা চৌধুরী নওয়াব (১৮৪৭/৪৮-১৯০৫)-এর 'রূপজালাল' (১৮৭৬) গ্রন্থের উল্লেখ পাই। এই গ্রন্থটি বেগম রোকেয়ার জন্মেরও (১৮৮০) চার বছর আগে প্রকাশিত হয়। ফয়জুন্নেসা চৌধুরী ছিলেন নোয়াখালি জেলার পশ্চিম গাঁ-এর জমিদার। বিভিন্ন জনহিতকর কাজে প্রভূত অর্থ দান করে গেছেন তিনি। তাঁকে 'নওয়াব' উপাধিতে ভূষিত করেন ইংল্যান্ডের রানি ভিক্টোরিয়া। এই সম্মানিত উপাধি ভারতবর্ষের আর কোনো মহিলা পাননি। ফয়জুন্নেসার যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল আরবি, ফরাসি ও সংস্কৃত ভাষায়। ঢাকা থেকে প্রকাশিত তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'রূপজালাল' সুললিত গদ্য ও পদ্য ছন্দে রচিত। প্রায় পাঁচশত পৃষ্ঠার এই সুদীর্ঘ গ্রন্থটি বিড়ম্বিত দাম্পত্য জীবনের এক করুণ রূপক কাহিনি।

GRPI রিপোর্টে আটজন আদি লেখিকার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

১। ১৮৫৬ -তে প্রকাশিত কলকাতার বাঙালি নারী কৃষ্ণকুমারী দাসী (মিত্র মুস্তোফী) রচিত প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ 'চিত্তবিলাসিনী' কাব্য।

২। ১৮৬১-তে প্রকাশিত পাবনার বামাসুন্দরী দেবী রচিত প্রথম গদ্য-গ্রন্থ 'কি কি কুসংস্কার তিরোহিত হইলে শীঘ্র এদেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে?'

৩। ১৮৬১-তে প্রকাশিত কলকাতার কালিঘাটের হরকুমারী দেবীর লেখা 'বিদ্যাদারিদ্র দলনী' নামের কাব্যগ্রন্থ।

৪। ১৮৬৩-তে প্রকাশিত কলকাতার কৈলাসবাসিনী দেবী (গুপ্ত) রচিত 'হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থা'।

৫। ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত কোন্নগরের মার্থা সৌদামিনী সিংহের লেখা চরিতগ্রন্থ 'নারীচরিত'।

৬। ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত কলকাতার রাখালমণি গুপ্তর 'কোন সদবংশীয়া কুলবধূ' নামে রচিত গ্রন্থ 'কবিতামালা'।

৭। ১৮৬৬-তে প্রকাশিত বামনগাছি-শিবপুরের কামিনীসুন্দরী দেবী রচিত 'উর্বশী' নাটক।

এবং

৮। ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত বরিশালের বসন্তকুমারী দাসী রচিত 'কবিতামঞ্জরী'।

"[As yet only eight ladies have made a public appearance as authors, of whom one is a christian convert and seven profess Hinduism. Of these Hindu ladies, three are Brahimns, two Baidyas and two Kayasthas, It is to be noticed that the three highest castes of the Hindus take the lead in regard to the advancement of women, as in most other improvements, but it is hoped other classes of the community will shortly be in a position to achieve similar honors for their daughters. (দ্র : General Report on public Instruction for 1866-67, Calcutta 1867, Appendix-A, Inspectors Reports—Central Division, P-81)

নিস্তারিণী দেবী

(১৮৩৩-১৯১৬)

॥ সেকেলে কথা ॥

খন্নেনের পঞ্চানন ঠাকুর জাগ্রত

হুগলির নিকট এখন যেখানে খন্নেন ইষ্টিসন হয়েছে, তার খুব কাছে চাটুয্যে মহাশয়ের কুঁড়ে ঘর ছিল। খন্নেনের চাটুয্যে মহাশয়ের নাম জানেন না এমন লোক তখন কেউ ছিল না। গাঁয়ের দেবতা পঞ্চানন ঠাকুরকে তিনিই প্রতিষ্ঠা করেন। পঞ্চানন জাগ্রত দেবতা। গাঁয়ের লোকে যেমন ঠাকুর মানে, তেমনই আমার ঠাকুরমার বাপকে (চাটুয্যে মহাশয়কে) মান্‌ত। চাটুয্যে মশাই পঞ্চানন ঠাকুর পূজা করে যা কিছু পেতেন, তাতে তাঁদের দুঃখ ঘুচত না। এখনকার নিষ্ঠাবান্ ভট্টাচার্য্যদের যেমন জীবন, আমার বুড়োদাদারও সেইরূপ ছিল। দেবতার মতো সুন্দর শরীর, গর্বিত ভাব, অমায়িক পরোপকারী চাটুয্যে মহাশয়ের নাম মনে হলে আজও আমার মনে আনন্দ হয়। আর যেমন তিনি পরোপকারী, গ্রামের লোকের কুলপুরোহিত, তেমনই তাঁর ঠাকুরটি। যে কেউ কিছু মানস করে, পঞ্চানন ঠাকুরের নামে চা'ল আর পয়সা বেঁধে তুলে রাখবে, তার সে মানস সফল না হয়ে যায় না। বন্ধ্যা স্ত্রীলোকেরা পঞ্চানন ঠাকুরের দোয়ার ধারে যে ছেলে পান, তাদের সকলের নামই পঞ্চানন বা পাঁচু রাখা হয়। এখন এদিকে যত পাঁচু নামের লোক আছে, সব এই পঞ্চাননের দোয়ারধরা ছেলে। কত পাঁচু নামের ছেলে আছে, পাসের খাতা দেখে, গুণে দেখ্‌লেই দাদামশায়ের খাতির কত বুঝা যাইবে।

বাজি রেখে সন্দেশ খাওয়া।

যারা সব বাজি রেখে বাবুদের বাড়ি সন্দেশ খেত, তারাও খাতির ক'রে দাদামশাইকে সালিশ মান্‌ত। দিন-ভোরের মধ্যে দশসের পনরসের পর্যন্ত সন্দেশ খেতে পারত, এমন লোকও তখন ছিল। ঠাকুরমার মুখে শুনেছি, তাঁর বাড়িতে এক বাঁড়ুয্যে মশাই এসে ছাতে বসে বমি করে এত সন্দেশ তুলেছিল, সেগুলো কত দিন ধরে ছাতে শুকিয়ে ছিল। যারা সব বাজি রেখে কাজ কত্তে ভরসা করে, তাদের মধ্যেই একাগ্রতা দেখ্‌তে পাওয়া যায়। এখনকার কালে যারা একরোকা, গাঁয়ে বারোয়ারি পূজা, কাঙালি খাওয়ান, যাত্রা দেওয়াতে যাদের আনন্দ, তারা এই বাজিরাখা দলের ছেলে।

ছোটো কুঁদুলি।

চাটুয্যে মহাশয়ের স্ত্রীবিয়োগের পর হইতে চাটুয্যে মশাইয়ের সংসারে দুঃখ কষ্টের আরম্ভ। মানুষ মাত্রেই যে ভালো ক'রে দুবেলা খেতে না পায়, সে হাজার ভালো মেজাজের হ'লেও কুঁদুলে লোক বলে পাড়ায় ঢি ঢি হয়ে যায়। আমার মনে হয়, ছোটো ছেলেদের মধ্যে যারা দুর্বল, তারাই বড়ো দুষ্ট হয়। তাদের ভালো করে খেতে দিলেই তাদের অনেক নষ্টামি কমে যায়। আমার ঠাকুরমার নামটি ছিল জগদম্বা। জীবনে আমার যে কোন বউদের সঙ্গে বনেনি, তা আমার ঠাকুরমার দোষ, আমার কি

দোষ? পাড়ার লোকে সকলে তাকে ছোটো কুঁদুলি বলে জানত। যখন চাটুয্যে মশাইয়ের স্ত্রীবিয়োগ হইল, তখন তিনি অন্য উপায় না দেখিয়া দারান্তর গ্রহণ করলেন।

মামার ঘরে মানুষ।

কুলীনের ঘরের সবাই মামার ঘরেই মানুষ। বাপের মুখ তখন প্রায় দেখা যাইত না। মামার বাড়িই আমাদের বাড়ি। এইজন্য বাড়ি কোথায় বলিলে, আমার গুষ্টির সকলেই মামার বাড়ির নাম উল্লেখ করে। মামাদের পয়সা থাক্‌লে তারা ঘরজামাই করিয়া রাখে। তখন বাবার মুখ দেখা যায়। কাকের বাসায় কোকিলেরা ডিম ফোটায় বলিয়া, কোকিলের সুস্বর যেমন কাকের রবের মতো কর্কশ হইয়া যায় না, সেইরূপ যারা মামার ঘরে মানুষ, তারাও মানুষ হইলে তেজি লোক হয়।

ঘরজামাই।

আমার ঠাকুরমার বাপ চাটুয্যে মহাশয়েরও সেই দশা হ'ল। দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি যাদের ব্রহ্মোত্তর কয় বিঘা জমি আছে, মরাই আছে, গোরু আছে, এমন ঘরে বিবাহ করিলেন, আর তিনি তাহাদের ঘরজামাই হইবার সত্য করিয়া বিবাহ করিলেন।

সত্যই ধর্ম।

তখনকার কালে সত্যই ছিল ধর্ম। তিনি ভাবিলেন মৃতা গৃহিণীর ছেলে রামধনকে পঞ্চানন ঠাকুরের পূজা কত্তে দিলে, সেইই সব চালিয়ে নেবে। মেয়ে রাঁধ্‌বে, পৈতে কাটবে। আমার খরচও বেঁচে যাবে। মাঝে মাঝে হেঁটে এসে এদের দেখে যাব। সত্য তো রাখ্‌তে হবে। সত্যই তো ধর্ম। আর আমার গৃহিণী নেই, তার আর গৃহ কী? আমি তো ফকির বললেই হয়।

ছুঁতোয় নাতায় কেঁদে নিত।

বোন জগদম্বা কোঁদল্ ক'রে বেড়ান, ভাই রামধন দুঃখের ধান্ধায় ফেরেন। দুঃখের জ্বালায় কাঁদ্‌লে, পাছে লোকে কিছু মনে করে, অথচ কাঁদ্‌লে শান্তি পাওয়া যায়। এই ভেবে বোনের কোঁদলের জন্য কেউ বল্‌তে এলে, যেন সেই জন্যই কাঁদচেন, এই ভাব দেখিয়ে দুঃখের কান্না কেঁদে নিতেন। ভাই বোনে পাতার জ্বালে রেঁধে খেতেন। ভাই বোনে শুকনো পাতা কুড়ুতে যেতেন। পঞ্চানন ঠাকুরের চাউল না পেলে খুদ রেঁধে খেতেন। পইতে কেটে যে পয়সা পেতেন, তাতেই খুদ কিনে আন্‌তেন।

গরিবের কন্যাদায় উদ্ধার।

যখন উপায়ান্তর না থাক্‌ত, তখন গরিবের কন্যাদায় উদ্ধার ক'রে আস্‌তেন, কুলীন বামনের ছেলের ১০/১২ টাকা বিবাহের যৌতুকে আর কতদিন চল্‌বে। আবার যাদের জমি, ধান, গোরু আছে, তাদের দেখাদেখি গরিবেরাও জামাইয়ের খাঁক্‌তি বুঝে ঘরজামায়ের কোট ক'রে বিয়ে দেবার চেষ্টা কত্তো। এরূপ সত্যের দায় হইতে শেষে রামধনও নিষ্কৃতি পান নাই, তবে বোনের বয়স ১৩/১৪

হয়েছে, তারও বিয়ে দেবার ব্যবস্থা ক'রে শ্বশুরের কুলের একটি ছেলের সহিত ভগিনীর বিবাহের কড়ারে নিজ গ্রামের নিকটেই বিবাহ করিলেন।

বউ আনা।

অনেক আপত্তির পর শেষে বউ ঘরে আসিল। বউয়ের হাতে কাসার পৈঁচে ও নোয়া; বোনের হাতেও তাই। বোনের হাতে মুড়কি মাদুলি ছিল, বউয়ের তাও ছিল। ভাইটি অবস্থাপন্ন লোকের মেয়েকে কোন কড়ার না করে বিয়ে ক'ত্তে না পেয়ে বড়ো দুঃখ কত্তো। বড়ো মেয়ে বিয়ে দিয়েও যারা বলে বউ আনতে নাই, তারা সেই কুলীনের ঘরের দলের পরপুরুষ।

ডান হাতে উপরি পণ, বাম হাতে মলত্যাগ।

রামধন মাঝে মাঝে প্রায়ই বলতেন, "আমরা কুলীন; শ্বশুর যদি পণের উপরি ডান হাতে দেন ও বাম হাতে বধূ মলত্যাগ করেন, তবুও আমরা কৃতার্থ মনে করি! আমার এ কি হইল!" পরের মেয়েকে গলায় বাঁধার চেয়ে অধর্ম নাই। মানুষ খেতে পায় না, তার খাবার লোক বেড়ে গেলে যেমন কষ্ট পায়, এমন কষ্ট তার আর কিছুই নাই। গরিবের ঘরে যাদের জন্ম, তারা চাকরি করে পয়সার মুখ দেখলে, কেউ এলে গেলে এই জন্যই বড়ো বিরক্ত হয়। কলকাতায় এই ভাবটা এখন বড়ো বেশি। কোন অতিথি এলে পয়সা দিয়ে হোটেলের ব্যবস্থা করে দেয়, তবুও হাঁড়ির ভাত দিতে কাতর হয়; কারণ, বাড়তি লোক সামনে থাকলে তাদের সেই পুরাণ দুঃখের কথা মনে হয়ে কষ্ট হয়। বিবাহ-পণের এই ভাবটাও একটা বাতিকে দাঁড়াইয়াছে। এখনকার লোকে দান অলঙ্কার বস্ত্রাদিকে আসল ও পণের নগদ মুদ্রাকে উপরি মনে করেও বধূমাতার ভালো মন্দ সোহাগ-খোয়ার দ্রব্যাদির ভালো-মন্দের উপর এখন নির্ভর করে!

ছেলে কাঁদলে মুড়ি দিলে থামে।

রামধনের দুঃখ দেখে ষষ্ঠীদেবীর বড়ো অনুগ্রহ হইল। ক্রমে ক্রমে বিষ্ণু, রাম, ঈশান, মহেশ, নীলমণি পাঁচ ছেলে হইল। ভগবান যাকে দয়া করেন, তাকে এইরূপ ক'রেই করেন। এক বছুরে আঞ্জা ছোটো ছোটো ছেলেগুলিকে এক যায়গায় বসিয়ে যখন পিতা রামধন এক পাত হইতে খুদের গরস গিলাইয়া দিতেন, ও না গিলিলে পিঠে কিল দিতেন, তখন সে দৃশ্যটি পাঠশালের গুরুমশায় ও পড়োদের মতো দেখাইত। ভগিনী জগদম্বাই পরিবেশন করিতেন। তিনি বউয়ের নামে নানা ছুতায় লাগাইতেন। ছেলেরা কাঁদিলে মুড়ি দিয়া থামাইতেন। তবে তিনি অন্য মেয়েদের মতো তরকারিতে নুন মিশাইয়া বউকে জ্বালাইতেন না।

ছেলেপোষাণি ভিক্ষেপুত্র।

যাদের জমি জমা আছে, অথচ খাবার লোক নাই, বাড়িতে ছেলে নাই, তারা যখন দুই তিন সংসার করিয়াও পুত্রের মুখ না দেখিতে পাইয়া আসন্ন কালে পিণ্ডের প্রত্যাশায় হতাশ হয়, তখন যাদের বেশি

ছেলে-পিলে থাকত, তাদের ঘর থেকে ছেলেপোষাণি নিত। ছেলে তার পরিবারকে মা বলিত, তাকে বাবা বলিত। পইতে দিয়া এই ভিক্ষাপুত্র পাকা করে নেওয়ার প্রথা তখন ছিল। পইতের সময় নেড়ামাথায় বিবাহ দিয়া কন্যা থাকিলে ঘরজামাই করিয়াও অনেকে পুত্রের সাধ মিটাইত। এখনও বড়ো ঘরে এই ভিক্ষাপুত্র দেওয়াতে অনেকে কিছুমাত্র অপমান বোধ করে না। ছেলে-কেনা, ছেলে-বেচা যেমন তখন ছিল, বাছুরের পোষাণির মতো ছেলেপোষাণি "ভিক্ষাপুত্র" প্রভৃতি তখন বেশ চলিত। তা বলিয়া রামধনের মত মানুষটি এরূপ করিতে স্বীকার পাইত না; বিশেষ ছেলেদের পিসি জগদম্বার কোঁদলের ভয়ে সেরূপ প্রস্তাব করিতেও কেহই অগ্রসর হয় নাই। জগদম্বা ছেলেগুলিকে প্রাণের সহিত ভালোবাসিত। বউ তো ভালো মানুষ, সে ছেলে বিইয়েই খালাস। পিসিমা জগদম্বাকেও মেও ধরিতে হইত। যত ঝক্যি ঝড়ের মতো জগদম্বার মাথার উপর দিয়া চলিয়া যাইত, জগদম্বা তাহা গ্রাহ্যই করিত না।

জামাই নিজের চাড়ে আসে।

জগদম্বা আমার ঠাকুরমা। তাঁর যেমন রূপ, তার উলটা স্বভাব। আমার কিন্তু ঠাকুরমাকে বড়ো ভালো লাগত। তিনি যাকে যা বলে গাল দিতেন, তাই ফলত; আবার যাকে যা বলে আশীর্বাদ কত্তেন, তার তাই ফলত। যাদের সঙ্গে ঝগড়া কত্তেন, তাদের ধুড়দুড়ী নেড়ে দিতেন; যাদের গতর দিয়ে উপকার কত্তেন, তারা কখনও ভুলত না। লক্ষ্মী ঠাকরুনের মতো তাঁর চুলের গোছা পিঠ জুড়িয়া পড়িয়া থাকিত। রূপের গরবে তিনি কখন গরবিণী হন নাই; তবুও তাঁর দুধে আলতার মতো রূপের তুলনায় পাড়ার লোকেরা সুন্দরীর উপমা দিত। বিবাহ হবার দিনের কথা অনেক মেয়ে ভুলে যায়, কিন্তু গ্রামে কারও ঘরে জামাই এলেই সেটি মনে পড়ে। তখন জামাই আনিতে বিশেষ কোন নিমন্ত্রণ করিতে হইত না। জামাই নিজের গরজে আসিত। জামাইয়ের খরচ কম হইয়া আসিলেই সে এক শ্বশুরবাড়ি হইতে অন্য শ্বশুরবাড়ি আসিত। তখনকার জামাইয়েরা মাথায় পুঁটুলি, হাতে লাঠি, কাঁধে গামছা, পায়ে এক পা ধূলা লইয়া মড় মড় করিয়া বাড়ির ভিতর ঢুকিয়া পড়িত। প্রথম তাড়না, পরে যত্ন, ইহাই জামাই-আদর।

বিবাহের হাতচিঠা খাতা।

কুলীনেরা যেখানে যেখানে বিবাহ করিত, সেখানকার খাতা রাখিত। আমার বৃদ্ধ পিতামহ মদনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের এইরূপ একখানি খাতা ছিল। তাহাতে তাঁহার ৫৬টি বিবাহের ঠিকানা লেখা ছিল এবং যে একটু স্থান খাতার পার্শ্বে ফাঁক থাকিত, সে স্থলে তিনি টাকার কথা, পুত্রাদির কথা এবং যে গুলি তাঁহার লোক-লৌকিকতা আদায়ের পক্ষে সুবিধাজনক, তাহাই লিখিয়া রাখিতেন। এ খাতাটি আমাদের দেশের যারা উটনো খায় তাদের হাতচিটা খাতার মতো। কলেক্টারীর তৌজী-বহির মতো তাহাতে কন্যার কত টাকা পণে কবে বিবাহ হইয়াছে, তাহা লেখা থাকিত। যেখানে পাওনা দক্ষিণা বেশি, সেখানে যাতায়াতও তত বেশি হইত।

১০৮টি বিবাহ।

শুনিয়াছি, আমর অতিবৃদ্ধপিতামহের ১০৮টি বিবাহ এবং পিতামহের ৫৪টি মাত্র। তখন যে যত বিবাহ করিতে পারিত সে তত ভালো কুলীন বলিয়া জনসমাজে বিদিত থাকিত। এখনকার ছেলেরা একটি পরিবারকে খাইতে দিতে পারে না, গলার বোঝা মনে করে; তখনকার পুরুষেরা শত পরিবারের পিতামাতার নিকট হইতে নিজের খরচ চালাইয়া লইত। তখন স্ব-ঘরে পাত্র পাওয়া কঠিন ছিল; আর এক এক ঘরে পুত্রের অপেক্ষা কন্যাসংখ্যা অনেক বেশি ছিল। পত্নীর ভরণপোষণ একটা কর্তব্যের মধ্যে, তাহা তখনকার বিবাহিতদের কল্পনায়ও আসিত না।

মেয়ে-বেচা—শয্যাতোলানি।

আবার যারা বংশজ, তাদের মধ্যে মেয়ে-বেচা চলত। পণ নিয়ে যারা মেয়ের বিয়ে দেয়, তাদেরই মেয়ে-বেচা বামুন বলে। তাদের কেবল বিবাহের সময় নয়, যখনি তাহারা শ্বশুরবাড়ি আসিত, তখনই তাদের শয্যাতোলানি দিতে হইত। এখনকার গ্রামভাটি, বাসর-জাগানি এ সব তখন বংশজদের নিকটা আদায় হইত। এখন এটা গৌরবের দান!

ছেলা-বেচা—পা-ধোয়ানি।

জগদম্বার যে দিন স্বামী আসিল, সে গৃহপ্রবেশ করিবামাত্র পা-ধোয়ানির জন্য তাগিদ করিল—সে যে কুলীন! তার পা-ধোয়ানি, নমস্কারি, ভোজন-দক্ষিণা, এ সকল না দিলে, সে এরূপ শ্বশুরগৃহে পা ধুইবে না, নমস্কারি কাপড় না হইলে একরাত্রও বাস করিব না, ভোজন-দক্ষিণা না পাইলে সে বাটীতে আর আহার করিবে না। সে তো বংশজ নহে—সে যে কুলীন!

স্বকৃত-ভঙ্গ।

আবার যে-সে কুলীন নহে—স্বকৃত-ভঙ্গ। নিজের কুল ভাঙিয়া পরের মেয়ের বাপের কুলের উদ্ধার করিবার জন্য দৃঢ়ব্রত। আমাদের দেশের মধ্যে যাহারা নিজের ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া পরধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে এবং চৌমাথায় দাঁড়াইয়া অন্য সকলকে সেরূপ করিতে ডাকে, তাদের দেখিলেই আমার মনে হয়, তারা বুঝি স্বকৃত-ভঙ্গ! নইলে এত পরোপকারী লোক মনুষ্যসমাজে দেখা যায় না। এখন যে লোকে স্ব ঘরে কন্যার বিবাহ দিবার জন্য এতটা বাড়াবাড়ি করে, তাহার দুইটি কারণ; একটি লাকের কাছে জাঁক দেখায়যে আমার পয়সা আছে; আর একটি তারা ছোটো বামুন তাদের কুলের আর কিছুই নাই, তারা কুলের দোষ ছাপিয়ে আছে; এটি আমার বিশ্বাস। তখনকার ভালো কুলীন আপনার কুল ভঙ্গ করিয়া বিবাহ ক'রে নিজেদের তেজস্বী স্বীকৃত-ভঙ্গ বলিয়া গৌরব করিতে পারিত; এখনকার ঢোঁড়া সাপেরা এই মেলের চক্রে প'ড়ে ভাতে হাত দিতে ছাইয়ে হাত দেয়।

ঘটি বাটি বাঁধা দিয়ে মানরক্ষা।

কোন রকমে ঘটি বাটি বাঁধা দিয়ে রামধন নিজের মান রক্ষা করিল। জগদম্বা স্বামীকে দেখিয়া যেন নূতন মানুষ হইয়া গেল; তাহার স্বভাব সে দিন লক্ষ্মী-ঠাক্‌রুণটির মতো কোমল হইয়াছিল। তার স্বামী